ইলেকট্রনের ভর

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

মহাবিশ্ব এক বিশাল ধাঁধা। এ ধাঁধার অনেকখানিই আমরা জানতে পেরেছি। তাও ধাঁধার যেন শেষ নেই। জর্জ বার্নাড শ যথার্থই বলেছিলেন, “বিজ্ঞান একটি সমস্যার সমাধান করে আরও আরও দশটি সমস্যার জন্ম দেয়। ফলে ধাঁধার জগৎ বড় হয়। এভাবেই বিজ্ঞান এগিয়ে চলে। এমনই এক ধাঁধা ইলেকট্রনের ভর।

মৌলিক কিছু ধ্রুবকের ওপর নির্ভর করে মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্য। এ ধ্রুবকের মধ্যে আছে আলোর বেগ, সার্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, প্ল্যাংক ধ্রুবক, মৌলিক কণাদের ভর ইত্যাদি। মজার ব্যাপার হলো, এ ধ্রুবকদের বেশিরভাগের মানে হেরফের হলেও মহাবিশ্বের কিছুই হবে না। এটি আগের মতই স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করবে। কিন্তু ইলেকট্রনের ভর আলাদা। এর মানে গড়বড় হবে তো, জটিল অণু তৈরি ও জীবনের অস্তিত্ব হবে অসম্ভব।

মহাবিশ্বের মৌলিক কণার তুলনামূলক শক্তির কোনো ব্যাখ্যা জানা নেই বিজ্ঞানীদের। জানা নেই, কেন কিছু কণার চার্জ আছে আর অন্য কণার নেই। কণাদের চার্জ কেন ঠিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাও অজানা। হিগস কণা থেকে মৌলিক ভর আসার কথা জানা থাকলেও পরিমাণটা কেন ওটাই তা নেই জানা। আলোর বেগ বা অন্য কণাদেরও মানের উৎসও জানা নেই কারও।

আমাদের বর্তমানে দেখা মহাবিশ্বকে বুঝতে লাগে ২৬টি আলাদা ধ্রুবক। এই ধ্রুবকদের কিছু কিছুর মান অনেকখানি এদিক-ওদিক হলে আমাদের চেনাজানা মহাবিশ্বটা আর তৈরি হত না। আমাদের অস্তিত্বই প্রমাণ করে, প্রকৃতির নিয়মের সাথে অস্তিত্বকে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। মহাকর্ষের মান একটু বেশি বা কমে হলেও ছায়াপথ, গ্রহ ও নক্ষত্র ঠিকই তৈরি হত। অন্যান্য বল, কোয়ার্কের ভর বা আলোর বেগের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। হ্যাঁ, পরমাণুর আকার হত বড় বা ছোট। আলো চোখে আসতে সময় লাগত ভিন্নরকম। মহাবিশ্বের বড় স্কেলের আকৃতি হয়ত একটু আলাদাই হত। তাও মহাবিশ্বের সৃষ্টি অসম্ভব হত না। কিন্তু ইলেকট্রনের ভর ভিন্ন হলে ব্যাপারটা হত একদম আলাদা।

চিত্র ১

*গঠনের দিক থেকে ভাবলে পরমাণুর প্রায় পুরোটাই ফাঁকা৷ কেন্দ্রে আছে ভারী নিউক্লিয়াস। বাকিটা ইলেকট্রন মেঘে ঢাকা। তাও অল্প আয়তনের ছোট্ট নিউক্লিয়াসেই আছে পরমাণুর ৯৯.৯৫ ভাগ ভর। আয়তনের দিক থেকে যদিও এর দখলে এক মিলিয়ন বিলিয়ন ভাগের এক ভাগেরও কম জায়গা।*

আমরা নিজেরাও তৈরি পরমাণু দিয়েই। পরমাণুর কেন্দ্রে আছে ছোট্ট, ভারী, ধনাত্মক চার্জধারী নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসে আছে পরমাণুর ৯৯.৯ ভাগের বেশি ভর। অথচ জায়গাটার আকার এত তুচ্ছ যে একে পরিমাপ করতে হয় ফেমটোমিটার (fm) এককে। এক মিটারকে ১০ কোটি-কোটি ভাগ করলে তার এক অংশের নাম হয় ফেমটোমিটার।

এই ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসকে ঘিরে পাক খায় ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াসের তুলনায় এদের আকার ও ভর নিতান্তই সামান্য। তবে চার্জ নিউক্লিয়াসে থাকা প্রোটনের সমান ও বিপরীত (-১)। বিজ্ঞানীরা কণাত্বরকযন্ত্রে পরীক্ষা করতে গিয়ে ইলেকট্রন-ইলেক্ট্রন সংঘর্ষ ঘটিয়েছেন। সংঘর্ষ ঘটিয়েছেন ইলেকট্রনের সাথে অন্য বহু কণার। সেখান থেকে বোঝা গেছে, ইলেকট্রনের বাস্তব কোনো আকার থেকে থাকলেও তা হবে ১০-৯ এর কম। একে বিন্দু মনে করলে খুব একটা ভুল কিছু বলা হবে না।

তবে পরমাণুর নিজের আকার এর উপাদানদের চেয়ে অনেক বড়। নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন। পরমাণুতে সাধারণত ইলেকট্রন ও প্রোটন সমান সংখ্যায় থাকে। ফলে পরমাণু সাধারণ অবস্থায় বৈদ্যুতিকভাবে প্রশম বা নিরপেক্ষ থাকে। ইলেকট্রন যেখানে বিন্দুসদৃশ, নিউক্লিয়াস সে তুলনায় অনেক বড়। ১০-১৫ মিটার বা ১ ফেমটোমিটার মাত্রার। ইলেকট্রনের চেয়ে অন্তত দশ হাজার গুণ বড়। নিউক্লিয়াসের চেয়ে পরমাণু আবার প্রায় এক লাখ গুণ বড় মাত্রার। এ আকার মাপা হয় অ্যাংস্ট্রম (Å) এককে। এক অ্যাংস্ট্রম হলো এক মিটারের এক হাজার কোটি ভাগের এক ভাগ। এর অর্থ দাঁড়ায়, পরমাণুর আকার ইলেকট্রনের তুলনায় একশ কোটি গুণ।

চিত্র ২ **(পুরো পৃষ্ঠা)**

*মানুষের দেহ কোষ দিয়ে তৈরি হলেও আরও মৌলিকভাবে তৈরি পরমাণু দিয়ে। একজন মানুষের শরীরে প্রায় ১০২৮টি পরমাণু আছে। সংখ্যায় হাইড্রোজেন সবচেয়ে বেশি। তবে ভরের হিসেবে বেশি অক্সিজেন ও কার্বন।*

আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে এ পরমাণুদের ওপর। দেহের ভেতরে থাকা সব প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা গণনা করলে পাওয়া যাবে বিশাল এক সংখ্যা। যা ১০২৯-এরও বেশি। এরা সমন্বিত হয়ে তৈরি করে পরমাণু। মহাবিশ্বে সবচেয়ে বেশি প্রাপ্ত পরমাণুর নাম হাইড্রোজেন। বিগ ব্যাংয়ের পর যা তৈরি হয়েছিল প্রচুর পরিমাণ। তবে মহাবিশ্বে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় প্রায় ৯০টি আলাদা ধরনের পরমাণু (এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত মৌলের সংখ্যা ১১৮ হলেও, এদের অনেকগুলোই কৃত্রিমভাবে তৈরি)। একটি আরেকটি থেকে আলাদ প্রোটনের সংখ্যায়। একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরিতে এগুলোর অনেকগুলোই অপরিহার্য। অক্সিজেন ও কার্বন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় আরও পরমাণুর মধ্যে আছে নাইট্রোজেন, ক্যালশিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার, সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেশিয়াম ও আয়রন। এসবগুলো উপাদান মিলেই তৈরি হয় মানবদেহের ৯৯.৯ ভাগ অংশ।

এদের মধ্যে শুধু হাইড্রোজেন তৈরি হয়েছিল বিগ ব্যাংয়ের পরপর। বাকিগুলোর জন্ম নক্ষত্রের ভেতরে বা পরবর্তী নাক্ষত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। মজার ব্যাপার হলো, মৌলিক ধ্রুবকগুলোতে খুব বেশি নয়-ছয় না হলে মহাবিশ্ব আগের মতোই থাকবে। থাকবে নক্ষত্র ও ছায়াপথ। নক্ষত্রের ভেতর চলবে ফিউশন প্রক্রিয়ায় আলো ও তাপ উৎপাদন।

চিত্র ৩

*মহাবিশ্বের প্রথম যুগের নক্ষত্ররা আজকের নক্ষত্র থেকে আলাদা ছিল। সেগুলোয় ছিল না ধাতব পরমাণু। নক্ষত্রগুলো ছিল অত্যন্ত ভারী। গ্যাসের আবরণে ঢাকা এ তারাদের একমাত্র নিয়তি ছিল সুপারনোভা হিসেবে বিস্ফোরিত হওয়া। নক্ষত্রের জন্মের আগে গ্যাসীয় মেঘরা দলা বেঁধেছিল। এমনও সম্ভব, সে সময়ের যেসমস্ত মেঘ ধীরে ঘনীভূত হচ্ছিল, সেগুলো এখনও নক্ষত্র হয়ে ওঠতে পারেনি। এভাবেই হয়তো থেকে যাবে মহাবিশ্বের অন্তিম সময় পর্যন্ত।*

আমাদের জানা জ্ঞান বলছে, মহাবিশ্বের জন্ম উত্তপ্ত বিগ ব্যাংয়ের মধ্য দিয়ে। এরপর এটি প্রসারিত হতে থাকে। কমতে থাকে তাপমাত্রা। ঘনত্ব ও সুষমতা (uniformity) কমে যায়। মহাকর্ষের বন্ধনে গুচ্ছবদ্ধ হতে থাকে ঘন হয়ে ওঠা জায়গাগুলো। শুরুতেই কোয়ার্ক ও গ্লুয়ন দিয়ে তৈরি হয় প্রোটন ও নিউট্রন। কোয়ার্কের কোনো ভর না থাকলেও এ কাজটি হতে কোনো বাধা ছিল না। এমনকি কোয়ার্কের ভর ১০ বা ১০০ গুণ হলেও অসুবিধা হত না। তাতে প্রোটন বা নিউট্রনের ভরে হত অতিসামান্য পরিবর্তন। প্রোটনের ভরের তুলনায় কোয়ার্কের ভর যে সামান্যই! প্রোটনের মোট ভরের মাত্র প্রায় ১ ভাগের জন্য কোয়ার্ক দায়ী। কোয়ার্কের ভর না থাকলেও তাই প্রোটনের ভর প্রায় একই থাকত।কারণ ভরটা মূলত নির্ভর করে গ্লুয়ন ক্ষেত্রের (gluon field) ওপর। এ ক্ষেত্রই সবল নিউক্লীয় বলের ক্ষেত্র তৈরি করে।

প্রোটন তৈরির একটু পরের ঘটনা। ঘটল নিউক্লীয় সংযোজনের বিক্রিয়া ফিউশন। তৈরি হয় হিলিয়াম ও লিথিয়াম। বলাই বাহুল্য, হাইড্রোজেন মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্ট পরমাণু। সাধারণত এতে একটি করে প্রোটন ও ইলেকট্রন থাকে। নিউক্লীয় ফিউশন পরবর্তীতে আবার ঘটে নক্ষত্রের অভ্যন্তরে। গ্যাসীয় মেঘ ঘনীভূত হয়ে হাইড্রোজেনরা জোড়া লাগতে থাকে। এক্ষেত্রেও ধ্রুবকদের মানের বড় পরিবর্তনও এ প্রক্রিয়াকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে না। মহাবিশ্ব তখনও ভরপুর থাকবে নক্ষত্রে সৃষ্ট কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও এমন আরও নানান মৌল বা পরমাণু দিয়ে।

আন্তঃনাক্ষত্রিক জগত নক্ষত্রের উপাদান ভরপুর হয়ে উঠলে শুরু হয় নতুন প্রজন্মের নক্ষত্র তৈরি। পরবর্তী প্রজন্মের নক্ষত্রগুলোয় ভারী মৌল থাকবে প্রচুর পরিমাণ। ফলে পাথুরে গ্রহ বা গ্যাসীয় দানব গ্রহের কক্ষপথে পাথুরে উপগ্রহ তৈরিত পথ খুলে যায়। আর তারই সাথে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনার দুয়ারও উন্মুক্ত হয়।

চিত্র ৪

*আমাদের সৌরজগতে একটি নক্ষত্রই রাজা। সূর্যের কাছের গ্রহরা পাথুরে গ্রহ (পৃথিবীসহ চারটি)। সূর্য থেকে মাঝামাঝি দুরত্বে আছে গ্রহাণুবেষ্টনী। তারপর আছে চার গ্যাসীয় দানব গ্রহরা। তার পরে আছে কাইপার বেল্ট ও উর্ট মেঘ অঞ্চল। যেসব নক্ষত্র আগের প্রজন্মের নক্ষত্রে তৈরি হওয়া ভারী উপাদান উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পায়, তাদের চারপাশেই শুধু পাথুরে গ্রহ তৈরি হতে পারে৷ আমাদের জানামতে, মহাবিশ্বে শুধু এভাবেই প্রাণের সঞ্চার হতে পারে।*

প্রায় যেকোনো মৌলিক ধ্রুবকের মানকে অনেকটা বড়-ছোট করলেও মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্যে তেমন নড়চড় হবে না। কোয়ার্কের ভর, মহাকর্ষীয় ধ্রুবক বা আলোর বেগ সবার জন্য খাটে এই কথা। কিন্তু ইলেকট্রনের ভরে নয়-ছয় করলেই সবকিছু আমূল পাল্টে যায়। জীবনের সম্ভাবনা যায় ধূলিস্যাৎ হয়ে।

ইলেকট্রনের ভর একটু বাড়ালে প্রথাগত পারমাণবিক ও আণবিক রূপান্তর হবে অসম্ভব। আবার ভর কমালে দুর্বল বা স্বল্প-শক্তির মিথস্ক্রিয়াও দীর্ঘ সময় ধরে স্থিতিশীল পরমাণু বা অণু তৈরির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

ব্যাপারটা আরেকটু বুঝতে উদাহরণ দেখি। সবচেয়ে সরল হাইড্রোজেনের কথাই ভাবুন। যেখানে কেন্দ্রের নিউক্লিয়াসে একটিমাত্র প্রোটন থাকে। আর তাকে প্রদক্ষিণ করে একটি ইলেকট্রন। এবার এর সাথে আরেকটি বিশেষ হাইড্রোজেনের তুলনা করি। অদ্ভুত ধরনের এ পরমাণু শুধু পরীক্ষাগারের বিশেষ অবস্থায় তৈরি সম্ভব। নাম মিউয়নিক হাইড্রোজেন।

চিত্র ৫

*সাধারণ হাইড্রোজেন ও মিউয়নিক হাইড্রোজেন প্রায় একইরকম। সাধারণ হাইড্রোজেনে দুটি আপ কোয়ার্ক, একটি ডাউন কোয়ার্ক ও একটি ইলেকট্রন থকে। আর মিউয়নিক হাইড্রোজনে ইলেকট্রনের বদলে থাকে মিউয়ন। তবে মিউয়নের ভর অনেকখানি বেশি। ফলে পরমাণুর আকার হয় ছোট। হাইড্রোজেনের আকার যেখানে এক অ্যাংস্ট্রম, মিউয়নিকের আকার সেখানে মাত্র ০.০০৫ অ্যাংস্ট্রম।*

প্রচলিত ও সাধারণ পদার্থ তৈরি হয় প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন দিয়ে। তবে সব বস্তু এভাবে গড়া নয়। প্রোটন ও নিউট্রন তৈরি আপ ও ডাউন কোয়ার্ক ধরনের কোয়ার্ক দিয়ে। কিন্তু আরও চার ধরনেরও কোয়ার্ক আছে। এদের নাম স্ট্রেঞ্জ, চার্ম, বটম ও টপ। ইলেকট্রন হয়তোবা সবচেয়ে হালকা চার্জধারী কণা। এর আরও ভারী দুটো জ্ঞাতিভাই আছে। মিউয়ন ও টাউ। স্বতন্ত্রভাবে দেখলে প্রোটন ও নিউট্রন স্থিতিশীল কণা। দুটোয় মিলে তৈরি পরমাণুর নিউক্লিয়াসও স্থিতিশীল। তবে ভারী কোয়ার্ক বা মিউয়ন ও টাউ দিয়ে তৈরি বস্তু অত স্থিতিশীল নয়। এরা খুব সহজে ভেঙে পড়তে পারে। অস্তিত্ব টেকে না বেশিক্ষণ। দুর্বল নিউক্লীয় মিথস্ক্রিয়ার কারণে এ ধরনের বস্তু ক্ষয় হয়ে গিয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি স্থিতিশীল কণা তৈরি করবে। (সবল নিউক্লীয় বলের কাজই হলো নিউক্লিয়াসের কণাদেরকে ধরে রাখা, আর দুর্বল নিউক্লীয় বল তার উল্টো।)

তবে অস্থিতিশীল মৌলিক কণাদের মধ্যে মিউয়নই সবচেয়ে বেশি সময় টিকে থাকে। গড় আয়ু ২.২ মাইক্রোসেকেন্ড। মানে এক সেকেন্ডের ১০ লাখ ভাগের ২২ ভাগ। সময়টাকে ক্ষুদ্র মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক। তবে এটুকু সময়ের মধ্যেই মিউয়ন প্রোটনের সাথে মিলে গিয়ে ব্যতিক্রমী (exotic) এক হাউড্রোজেন তৈরি করে। এর সাথে সাধারণ হাইড্রোজেনের অনেকগুলো তফাত আছে। অবশ্য ইলেকট্রনের মতোই মিউয়ন একটি লেপটন জাতের কণা। এরও চার্জ প্রোটনের সমান ও বিপরীত। ভর প্রোটনের চেয় অনেক অনেক কম। তবে মিউয়নের ভর ইলেকট্রনের ২০০ গুণের বেশি (সঠিক করে বললে ২০৬ গুণ)। অথচ চার্জ সমান। কিন্তু ভর বেশি হওয়ার কারণে বৈদ্যুতিক বল অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। এ বলই ইলেকট্রনকে নিউক্লিয়াসের কক্ষপথে ধরে রাখে। নিজস্ব গতির কারণে ইলেকট্রন ক্ক্ষপথ থেকে ছুটে হারিয়ে যায় না। ভারী মিউয়ন ইলেকট্রনের চেয়ে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বেশি কাছে চলে আসে।

আসলে হিসাবটাও সরলই। মিউয়ন ২০৬ গুন ভারী কিন্তু সমান চার্জধারী। ফলে মিউয়নিক হাইড্রোজেনের ব্যাসার্ধ সাধারণ হাইড্রোজেনের তুলনায় ২০৬ ভাগের এক ভাগ। সাধারণ হাইড্রোজেনের আকার ১০-১০ মিটার। সে তুলনায় মিউয়নিক হাইড্রোজেনের আকার ০.০০৫ অ্যাংসট্রম। মিউয়ন ইলেকট্রনের চেয়ে ভারী হওয়ার আরেকটি ফল কণাটি বেশি অস্থিতিশীল। স্বতস্ফূর্তভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ইলেকট্রনে পরিণত হয়। সাথে (ভরের বাকি অংশ থেকে) তৈরি হয় ইলেকট্রন অ্যান্টিনিউট্রিনো ও মিউয়ন নিউট্রিনো নামের কণা। এতে সময় লাগে মাত্র কয়েক মাইক্রোসেকেন্ড। তবে এ স্বল্প সময়েই দুই ধরনের হাইড্রোজেনের মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ধরা পড়ে।

সবচেয়ে বড় পার্থক্য সম্ভবত কক্ষপথ বা শক্তিস্তরে। সাধারণ হাইড্রোজেনের শুধু নির্দিষ্ট কিছু শক্তিস্তর আছে। গ্রাউন্ড অবস্থা (n=1), উত্তেজিত অবস্থা (n=2) ও একদম শেষের সম্পূর্ণ আয়নিত অবস্থা (ইলেকট্রন-প্রোটন সংখ্যার তারতম্য থাকে যখন, n=∞)। উপরের শক্তিস্তরে যেতে হলে উপযুক্ত শক্তির একটি ফোটনের (আলোর কণা) সাথে মিথস্ক্রিয়া হতে হয়। সবচেয়ে নিচের গ্রাউন্ড অবস্থা থেকে প্রথম উত্তেজিত স্তরে যেতে শক্তি প্রয়োজন ১০.২ ইলেকট্রন ভোল্ট। পুরোপুরি আয়নিত হতে প্রয়োজন ১৩.৬ ইলেকট্রন ভোল্ট। মিউয়নের ক্ষেত্রে লাগে ২০৬ গুন শক্তি। তাই মিউয়নিক হাইড্রোজেন উত্তেজিত হতে ২.১ কিলোইলেকট্রন ভোল্ট সম্পন্ন ফোটন লাগবে। আর আয়নিত হতে লাগবে ২.৮ কিলোইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি।

চিত্র ৬

*বর্ণালীতে সূর্যের যে আলো দেখা যায় তা তৈরির জন্য দায়ী নিউক্লিীয় ফিউশন। এ প্রক্রিয়ায় মূলত হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়। নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় সূর্যের কেন্দ্রে নিউট্রিনো ও গামা রশ্মি বিকিরণ তৈরি হয়। কিন্তু সূর্যের পুরু স্তর ভেদ করে সব বিকিরণ বাইরের দিকে আসতে পারে না। সূর্যের আলো সূর্যের দৃশ্যমান আলেকামণ্ডল (photosphere) পাড়ি দেওয়ার সময় গামা বিকিরণের বড় একটি অংশ পেছনে থেকে যায়। সৌরশক্তির এক লাখ কোটির মাত্র এক ভাগ এক্স-রে আকারে বেরিয়ে আসে।*

মহাবিশ্বে এ শক্তির ফোটন আছে। তবে খুব দুর্লভ। এরাই এক্স-রের উদাহরণ। সূর্যের মতো তারারা এক্স-রে উৎপাদন করে। কিন্তু তার পরিমাণ খুব সামান্য। দৃশ্যমান আলোর এক লাখ কোটির মাত্র এক ভাগ আলো এক্স-রে হিসেবে আসে। পৃথিবীর সব রকমের আণবিক ও পারমাণবিক প্রক্রিয়া সূর্যালোকের জন্যই সম্ভব হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সালোকসংশ্লেষণ তো সরাসরি সূর্যের ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর প্রতি বর্গমিটারে সূর্য প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৫০০ ওয়াট শক্তি ঢেলে দেয়। এর বেশিরভাগই আসে দৃশ্যমান আলো, অবলোহিত ও অতিবেগুনি আলো হিসেবে। মাত্র দশ ন্যানোটনের মতো শক্তি আসে এক্স-রে আকারে।

ইলেকট্রনের নিশ্চল ভর বর্তমান মানের চেয়ে বেশ কিছুটা বেশি হলে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো বলতে গেলে ঘটতই না। কারণ মহাবিশ্বের তেজস্বী ঘটনাগুলো হত দুর্লভ। নক্ষত্রের ফিউশন ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মাধ্যমে আণবিক বা পারমাণবিক রূপান্তর ঘটা সম্ভব হত না। আর তা না হলে কোনো ধরনের জটিল রসায়ন, শৃংখল বিক্রিয়া বা প্রাণধারণ প্রক্রিয়া ঘটত না। যে মহাবিশ্বে ইলেকট্রনের ভর মাত্র ১০ ভাগ বা (সম্ভবত আরও কম) এদিক-সেদিক হবে, সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব তৈরি হওয়া আমাদের জানামতে সম্ভব নয়।

ইলেকট্রন হালকা হলেও সমস্যা হত। ভারী ইলেকট্রন বানায় ছোট ও দৃঢ় পরমাণু, যাকে সহজে উত্তেজিত করা যায় না। ফলে আয়ন তৈরি ও বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। হালকা ইলেকট্রন সেখানে বানাবে বড় ও হালকা বন্ধনের পরমাণু। যা সহজেই উত্তেজিত বা আয়নিত হয়ে যাবে। ভারী ইলেকট্রনের মতো সমস্যাটা শুধু হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে নয়, ঘটবে সব পরমাণুর ক্ষেত্রেই।

এবার মনে করুন, দৃশ্যমান আলোক কণার গড় শক্তি ২ বা ৩ ইলেকট্রন ভোল্ট। ইলেকট্রনের ভর মাত্র ২০% কমালে সূর্যের আলোর আণবিক ও পারমাণবিক রূপান্তর ঘটার বদলে এ বন্ধনগুলো ক্রমাগত ভেঙে পড়বে। সূর্যের আলো পেলেই পরমাণু ও অণুগুলো হয়ে যাবে আয়নিত।

সৌরশক্তি গড়তে যেমন পারে, তেমন ভাঙতেও পারে। এর কারণ ইলেকট্রনের ভর আছে দারুণ ভারসাম্যে। পারমাণবিক ও আণবিক রূপান্তরের উদ্দীপনা ঘটে। কিন্তু সূর্যের আলোর প্রভাবে আবার বন্ধনগুলো ভেঙে যায় না।

চিত্র ৭

*চিত্রে আলো উৎপাদী জটিল অণু ২ (LH2) দেখা যাচ্ছে। প্রাপ্ত ফোটন শক্তিকে সালোকসংশ্লেষী বিক্রিয়া কেন্দ্র পাঠিয়ে দিতে এটি ভূমিকা রাখে। এ অ্যান্টিনা প্রোটিন খুব কার্যকরভাবে শক্তির পরিবহন ঘটায়।*

ইলেকট্রনের ভর ছাড়া অন্য ধ্রুবকগুলোকে ১০, ১০০, ১০০০ বা তারও বেশি গুন বেদিক-ওদিক করলেও আমাদের জানা মহাবিশ্ব টিকে থাকবে। কোনো না কোনো আকারে থাকবে পরমাণু, অণু, নক্ষত্র, ছায়াপথ, ব্ল্যাকহোল, নিউক্লীয় ফিউশন, রসায়ন ও জীবন। কিন্তু ইলেকট্রনের ভর হাঁটে ভিন্ন পথে। ভর একটু হালকা হলেই অণু ও পরমাণু অতিসহজে ভেঙে যেত। কিছু তৈরিই হতে পারত না। ভর একটু বেশি হলে আবার ঘটত না কোনো রূপান্তর। পরমাণু ও অণু গেঁথে থাকত শক্তভাবে। হত না কোনো বিক্রিয়া। রসায়ন ও প্রাণের বিকাশ হত সুদূর পরাহত।

লেখক: প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, সিলেট ক্যাডেট কলেজ

সূত্র: বিগথিংক ডট কম

https://bigthink.com/starts-with-a-bang/electron-mass-vital-life-in-universe/